গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৮ সংখ্যা | ২১ - ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

জয়ী হলে বলতেন ঠিক উল্টো কথা

দিল্লি ভোটের ফল বেরনোর দুদিন বাদে বিজেপি নেতা অমিত শাহ মুখোমুখি হলেন সাংবাদিকদের। তিনিই ছিলেন দিল্লি ভোটে দলের প্রধান সেনাপতি। এমন শোচনীয় পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভোটের মূল্যায়নে আমাদের ভুল হয়েছিল।' অর্থাৎ ভোটের ফল বেরনোর আগে বিজেপিই সরকার গড়বে বলে যে দাবি তিনি করেছিলেন সেই মূল্যায়নে ভুল ছিল। কেন বিজেপি হারল তার জবাবে তিনি বলেছেন, শাহিনবাগকে পাকিস্তান বলে যেভাবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অন্যান্য নেতারাও যেসব কুকথার বন্যা ছুটিয়েছিলেন সেগুলো ঠিক হয়নি। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। বিজেপি নেতা বলছেন— কুকথা বলা ঠিক হয়নি, একথা শুনতে ভারতবাসী অভ্যস্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। তাদের চেনা কথা হল, বেশ করেছি বলেছি, আরও বলব। তা হলে অমিত শাহ এবার উল্টো কথা বললেন কেন? এ ছাড়া বলার আর কিছু ছিল না। কিন্তু যদি মনে করেন, এগুলো তাঁর অন্তরের কথা, তবে ভুল হবে। যদি কোনও ভাবে বিজেপি এই নির্বাচনে জিততে পারত, তা হলেই অমিত শাহরা বুক বাজিয়ে নিজেদের কৌশলের জয়গান গাইতেন। কুকথাকেই নির্বাচনের মহৎ কৌশল বলে প্রচার করতেন। অর্থাৎ জয়ী হলেই মিথ্যা সত্য হয়ে যেত, অনৈতিকতা নৈতিক ও সভ্য আচরণ হয়ে যেত। এ জন্যই ভারতের পার্লামেন্টারি রাজনীতির অঙ্গন এতটাই পচে গিয়েছে যে তার দুর্গন্ধে টেকা দায়।

দিল্লি নির্বাচনের আগে যতগুলি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তার বেশিরভাগেই বিজেপি পরাজিত হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপিকে গদিচ্যুত করেছিল সেখানকার মানুষ। মহারাষ্ট্রে বিজেপি গদিচ্যুত। অতি সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডেও ক্ষমতা হারিয়েছে বিজেপি। হরিয়ানায় গঠন করেছে এক গোঁজামিলের সরকার। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষকে যে অজস্র প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছিল বিজেপি, প্রমাণ হয়ে যায় তার সবই ভুয়ো। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির জনসমর্থন পৌঁছে যায় একেবারে তলানিতে। বিজেপি নেতারা বুঝে যান, গত পাঁচ বছরের কাজের যা রেকর্ড তা দিয়ে আর যা-ই হোক, নির্বাচনে জেতা যাবে না। বেকারসমস্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। এই অবস্থায় তাঁদের দরকার ছিল একটা পুলওয়ামা, বালাকোটে বিমান হানার গল্প। পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের এক বছর পরও সরকার তা নিয়ে কী তদন্ত করেছে, আদৌ কোনও তদন্ত হয়েছে কি না, তা না জানতে পারল দেশের মানুষ, না জানতে পারল নিহত জওয়ানদের পরিবার-পরিজনরা। এই অবস্থায় দিল্লি নির্বাচনে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে বিজেপির বলার কিছুই ছিল না।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রচারে বিজেপির কোনও নেতাই উন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, মন্দা প্রভৃতি বিষয়গুলির ধার দিয়েও যাননি। তাঁদের একমাত্র ইস্যু

ছয়ের পাতায় দেখুন

জনদরদি বিজেপি সরকার এক ধাক্কায় গ্যাসের দাম করে দিল ৯০০ টাকা

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভে এস ইউ সি আই (সি)। ছবি মেদিনীপুর।

'মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা'

প্যালেস্টিনীয়দের অস্তিত্বকে কার্যত নস্যাৎ করার নয়া কৌশল

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসনের নাম করে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক 'শান্তি পরিকল্পনা' নিয়ে হাজির হয়েছে। 'শতাব্দীর চুক্তি' নাম দিয়ে উগ্র ইহুদিবাদী শাসককুল সহ ইজরায়েলের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি এই 'শান্তি পরিকল্পনা'র প্রশংসায় মুখর। তাদের হিসাবে, এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নির্মূল করা যাবে। এই কারণে ইজরায়েলের বামপন্থী শক্তি, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) এবং যাঁরা দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন, তাঁরা এর বিরুদ্ধতা করছেন। বিষয়টি এমনই যে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমও বাধ্য হয়ে বলছে— প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে প্যালেস্টাইনের জনসাধারণ ও গোটা বিশ্বের মানুষের যে ভাবনা রয়েছে, এই পরিকল্পনা তা বানচাল করারই ষড়যন্ত্র নয়?

শান্তি পরিকল্পনা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-র উপস্থিতিতে এ বছরের ২০ জানুয়ারি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনার

দুয়ের পাতায় দেখুন

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সম্মেলন

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র ডাকে সর্বভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। (বিস্তারিত পরবর্তী সংখ্যায়)

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা

একের পাতার পর

রূপরেখাটি তুলে ধরেন। লক্ষ করার বিষয়, এ ব্যাপারে প্যালেস্টিনীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও আলোচনার ধার ধারেননি তাঁরা। এই পরিকল্পনায় প্রাচীন শহরটি সমেত জেরুজালেমকে ইজরায়েলের অবিভক্ত রাজধানী বানাতে চেয়েছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি, ১৯৬৭-র পর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও পূর্ব জেরুজালেমে ইজরায়েলিরা যে সমস্ত বেআইনি বসতি তৈরি করেছে, সেগুলিকে ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এর সাথে জর্ডন উপত্যকাকেও ইজরায়েলে সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে জর্ডন নদী বরাবর ইজরায়েলের একটি স্থায়ী পূর্ব সীমান্ত তৈরি করা যায় এবং প্যালেস্টাইন হয়ে পড়ে ইজরায়েলি এলাকা দিয়ে ঘিরে রাখা বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্র। ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় জেরুজালেমের বাইরে অবস্থিত 'আবু ডিস'-কে ভবিষ্যতের প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের রাজধানী করার প্রস্তাবও রয়েছে যা প্যালেস্টাইনের জনগণ সেই মুহূর্তেই প্রত্যাখ্যান করেছে (আল-জাজিরা, ১ ফেব্রুয়ারি, '২০)। বোঝাই যায়, এই 'শান্তি পরিকল্পনা'টি পুরোপুরি ইজরায়েলের স্বার্থরক্ষা এবং প্যালেস্টাইনের মানুষের ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

পরিকল্পনায় কতকগুলি শর্ত দেওয়া হয়েছে যা পূরণ করতে পারলে তবেই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যদি শর্ত পূরণ না হয় তাহলে মিলিটারি নামিয়ে এলাকা দখল করে নেওয়ার অধিকার থাকবে ইজরায়েলের। প্যালেস্টাইন শর্ত পূরণ করতে পারল কি না, তা বিচারের দায়িত্বও কিন্তু থাকবে ইজরায়েল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই।

পরিকল্পনা পেশের সময়কালটিও লক্ষ করার মতো। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, প্যালেস্টাইনের মতো দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট চালানোর কারণে গোটা বিশ্বের মতো মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের কাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত ধিক্কৃত। তার উপর, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপর লক্ষ্যস্থল ইরান মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারে রণকৌশলগত লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে বলে অনেকের অভিমত। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প তাঁর ধূসর ভাবমূর্তি ধুলো ঝেড়ে উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ঔদ্ধত্য ও পেশিশক্তির আস্ফালন দেখাতে এই 'শান্তি পরিকল্পনা' কায়েম করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যার ইতিহাসে চোখ রাখা জরুরি।

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যা

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যা বাস্তবে প্যালেস্টিনীয় জনগণের জীবন বলি দিয়ে উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদী কৌশল যার পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সর্বাত্মক সমর্থন। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য আশ্রয়স্থল (ন্যাশনাল হোম) প্রতিষ্ঠা করবে, যদিও প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদিরা হলেন ৮ শতাংশেরও কম। ৩০ বছর পর রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইনকে ভাগ করার সুপারিশ করে— জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম এবং মোট জমির ৭ শতাংশেরও কম অংশের দখলদার ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ করে মোট এলাকার বেশিরভাগ অংশ। এর পর প্যালেস্টাইনের বাসিন্দা আরবদের জন্য বরাদ্দ অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি অংশ দখল করে ইজরায়েল এবং উচ্ছেদ হয়ে পড়া আরব জনগণকে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে দেয় না। ১৯৬৭-র যুদ্ধের পর ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের অবশিষ্ট জমির ২২ শতাংশ দখল করে নেয়। পাশাপাশি মিশরের কাছ থেকে সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান হাইটস কেড়ে নেয়। অধিকৃত এলাকায় বেআইনিভাবে বসতি স্থাপন করে ইজরায়েল এবং একই এলাকায় বসবাসকারী ইজরায়েলি ও প্যালেস্টিনীয় আরবদের জন্য আলাদা আইন-কানুন চালু করে শাসন ব্যবস্থার পত্তন করে। ১৯৮০ সালে ইজরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব জেরুজালেমের দখল নেয়। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি অনুযায়ী, দ্বীপের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু এলাকার ওপর প্যালেস্টিনীয়রা সীমিত আকারে স্বশাসনের অধিকার পায়। এই চুক্তিতে ইজরায়েলি বসতিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার কথা তো ছিলই না, এমনকি বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া বন্ধ করার কথাও এতে বলা হয়নি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্যালেস্টাইনকে গড়ে তোলার নামে ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের আমল থেকে ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমল পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যা করেছে তা হল— গোটা এলাকার এক-চতুর্থাংশেরও কম অঞ্চলে ভূমিপুত্র আরবদের আটকে ফেলে আরও এলাকা দখলে ইজরায়েলকে সাহায্য করা এবং প্যালেস্টাইনের সামরিক শক্তি হ্রাস করা। এসবই তারা করেছে প্যালেস্টাইনের স্বশাসনের অধিকার বৃদ্ধি করার নাম করে। অবস্থা এখন এমন যে, ইজরায়েলের সেনাবাহিনীও স্বীকার করছে— ইজরায়েলের আয়ত্তাধীন এলাকায় ইহুদিদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় বাস করেন প্যালেস্টিনীয়রা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলের এই সম্প্রসারণবাদ ও নিপীড়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের নামে 'শান্তি পরিকল্পনা' বানিয়েছে। পরিকল্পনায় কতকগুলি শর্ত দেওয়া হয়েছে যা পূরণ করতে পারলে তবেই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যদি শর্ত পূরণ না হয় তাহলে মিলিটারি নামিয়ে এলাকা দখল করে নেওয়ার অধিকার থাকবে ইজরায়েলের। প্যালেস্টাইন শর্ত পূরণ করতে পারল কি না, তা বিচারের দায়িত্বও কিন্তু থাকবে ইজরায়েল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই। শান্তি পরিকল্পনা আরও নানা সুপারিশ করেছে। যেমন, পুরো এলাকার আকাশপথ ও 'ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রাম'-এর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থেকে যাবে ইজরায়েলের হাতে। ইজরায়েলি নৌবাহিনীর অধিকারে থাকবে 'নিষিদ্ধ' অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সামগ্রী প্যালেস্টাইনে ঢোকার পথে আটকে দেওয়ার— যদিও কোন অস্ত্র আটকানো হবে আর কোনটা ছাড় পাবে, তা-ও ঠিক করবে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইন অন্য কোনও দেশ বা সংস্থার সাথে কূটনৈতিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমন কোনও চুক্তি করতে পারবে না যা ইজরায়েলের 'না-পসন্দ'। এছাড়াও, পরিকল্পনায় রয়েছে আল-আকসা মসজিদ সহ 'টেম্পল-মাউন্ট'কে ইজরায়েলের আওতায় রাখার কথা। প্যালেস্টাইনের চাষবাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যে জর্ডন নদী ও জর্ডন উপত্যকার, সেই উপত্যকার ওপরেও ইজরায়েলি আধিপত্য কায়েমের কথা রয়েছে।

বিরোধিতায় সোচ্চার নানা দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনার শর্তগুলি জেনে প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২৯ জানুয়ারি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, "জেরুজালেম এবং আমাদের অধিকারগুলি বিক্রি কিংবা দরাদরি করার জিনিস নয়।" ওই দিনই প্যালেস্টাইনের হাজার হাজার মানুষ গাজা ভূখণ্ডে বিক্ষোভ দেখান, প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। 'শান্তি পরিকল্পনা'র প্রতিবাদে প্যালেস্টিনীয় কর্তৃপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের সঙ্গে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয় সহ সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছে। ২২ সদস্য দেশের সংগঠন 'আরব লীগ' 'মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা' প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, ১৯৬৭-র যুদ্ধের আগেকার সীমানাকে মেনে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন ও তার রাজধানী হিসাবে পূর্ব জেরুজালেমকে এই পরিকল্পনায় স্বীকৃতি দেওয়া না হলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ট্রাম্পকে তারা কোনও রকম সাহায্য করবে না। আরব দেশগুলিও ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ৫৭ সদস্যের সংগঠন 'অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন' প্রত্যাখ্যান করেছে এই পরিকল্পনা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। প্রতিবাদ এসেছে তুরস্ক, কাতার ও জর্ডন থেকেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও সৌদি আরবের মতো দেশও বলেছে, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনে বাধা দেয় যেসব ইহুদি বসতি, সেগুলিকে তারা সমর্থন করে না। বাস্তবিকই ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রসংঘের ২৪২ নং প্রস্তাবকে সরাসরি অস্বীকার করে, যেখানে ইজরায়েলি বসতিগুলি উঠিয়ে নিয়ে প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কী করা উচিত

এই পরিস্থিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার অর্জন করতে হলে প্যালেস্টাইনের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে তোলা এবং ১৯৬৭-তে ইজরায়েল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষেরও সোচ্চার হওয়া কর্তব্য। আইন, ন্যায্যতা ও মানবিকতার খাতিরে প্যালেস্টাইনের সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলাই এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত।

উত্তরপ্রদেশে এনআরসি-সিএএ বিরোধী অবস্থান

১৬ ফেব্রুয়ারি, রওশনবাগ, এলাহাবাদ। বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস নেত্রী কমরেড লতা শর্মা

দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি সিপিডিআরএস-এর

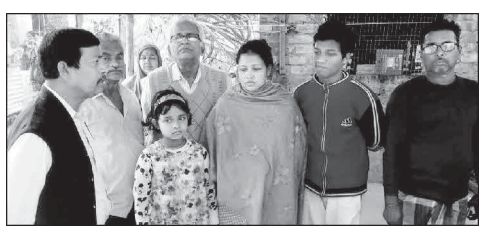

উত্তর ২৪ পরগনার বিশরপাড়ায় ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়ে সাইকেলে নিয়ে ফিরছিল বাবা। এই সময় রাস্তার ধারে এক মহিলার গায়ে সাইকেলের সামান্য ধাক্কা লাগে। এই অপরাধে ছেলেটিকে পেটানো হয় বেধড়ক। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জেলা সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি সুশীল আইচ, শিশির মল্লিক, শেখ আব্দুল আলিম এবং সৈকত দে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে এবং পরিদর্শন করতে যান। দোষীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতে নিমতা থানা ও ডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পরিচারিকা সমিতির আন্দোলনের জয়

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে সভানেত্রী লিলি পাল ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে জানান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করেন অসংগঠিত শ্রমিকদের এমনকি গৃহ পরিচারিকাদের ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের বিমা প্রিমিয়ামের দায়িত্ব সরকার নেবেন । আমাদের সংগঠনের দীর্ঘ দিনের দাবি আজ সরকার মানতে বাধ্য হল। আমরা সংগঠনের পক্ষথেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই, সাথে সাথে সমস্ত পরিচারিকা মা-বোনেদের আন্দোলনের এই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

পুলওয়ামা বিস্ফোরণ
জবাব চাইছে দেশবাসী

পুলওয়ামায় ৪০ জন জওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যুর এক বছর পার হয়ে গেল। বর্ষপূর্তিতে বিজেপি স্থানে স্থানে 'শহিদ' দিবস পালন করল। কিন্তু আজও তার তদন্ত করল না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল বিরাট সেনা কনভয়। কফিনবন্দি সারি সারি জওয়ানের দেহের সামনে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ সেনাবাহিনীর কর্তারা কত দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। আর একটি ছবিও দেখা গিয়েছিল সেদিন। মৃতদেহ আঁকড়ে আছাড় খাচ্ছেন কোনও জওয়ানের মা, কারও স্ত্রী, কারও শিশু সন্তান। স্বজন হারানো মানুষগুলির এই শোকের কি মূল্য দিল বিজেপি সরকার?

এতজন জওয়ানের মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? সেই প্রশ্ন আবারও ফিরে ফিরে আসছে। আজও তদন্ত হল না কেন পুলওয়ামা বিস্ফোরণের? কে বা কারা জড়িত তার কোনও হদিস পেল না কেন মৃতদের পরিজনরা কিংবা দেশের মানুষ? আজ পর্যন্ত কোনও চার্জশিট দিতে পারল না কেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা? সীমান্তে কড়া সেনা পাহারার নজর এড়িয়ে কীভাবে ৮০ কেজি বিস্ফোরক ঢুকতে পারল? এর জবাব তো কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশবাসীর সামনে দিতে হবে।

এই ঘটনার পর পাকিস্তানের দিকে ছদ্ম-গোলা নিক্ষেপ করে মানুষের দেশাত্মবোধের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে দেশের মানুষকে মাতিয়ে দিয়ে দিব্যি মসনদে বসেছিল বিজেপি। বিস্ফোরণের ১২ দিনের মাথায় পাকিস্তানের বালাকোটে বিমান হানা চালিয়ে সরকার দাবি করেছিল, সন্ত্রাসবাদী জইশের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৌলতে এই দাবির সত্যতা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। যদিও এতে ভোট-বৈতরণী পেরোতে অসুবিধা হয়নি বিজেপির। প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারা মানুষের ভাবাবেগকে পুঁজি করতে সরাসরি পুলওয়ামায় নিহত জওয়ানদের নাম করে ভোট চেয়েছিলেন।

বেকারি-মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত মানুষ সাময়িকভাবে সরকার বিরোধী ক্ষোভ ভুলে দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে ২০১৯ সালে পুনরায় বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। ৩০৩টি আসন নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পিছনে কি ওই ৪০ জন জওয়ানের বলিদানের ভূমিকা ছিল না? ভারত সরকারের সর্বোচ্চ কমান্ডো বাহিনী এনএসজি এবং 'র'-এর কর্তারা পর্যন্ত এ প্রশ্ন তুলেছেন (আজকাল-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০)।

কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ, আইবি কিংবা 'র' দ্রুত ৪০ জন জওয়ানের হত্যার তদন্ত করতে পারল না কেন? এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে সত্যিকারের অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন? নাকি পুলওয়ামার ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে এলে সরকারের অস্বস্তি বাড়বে? সেই কারণেই কি তদন্তে তাদের অনীহা?

পুলওয়ামা বিস্ফোরণের ঠিক ৬ দিন আগে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এক সিনিয়র অফিসারের স্বাক্ষর করা একটি সরকারি নির্দেশনামা সিআরপিএফ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, আইবি এবং সামরিক বাহিনী-পুলিশ যৌথ কমান্ডোর সর্বোচ্চ অধিকারীদের কাছে পৌঁছেছিল। তৎকালীন জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল টিভি চ্যানেলের সামনে ঘটনার দিনই স্বীকার করেছিলেন এই নির্দেশনামার কথা। যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, খুব শীঘ্রই সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনীর ওপর অত্যন্ত বড় মাপের আইইডি হামলা হতে চলেছে। তার পরেও সিআরপিএফ এত বড় কনভয় নিয়ে গেল কী করে? বাধ্যতামূলক আকাশপথে নজরদারি ছাড়াই প্রায় ৭৮টি গাড়ি এবং ২৫০০-এর বেশি জওয়ান নিয়ে এতটা রাস্তা পাড়ি দিলই বা কেন? এত বড় বাহিনীকে আকাশপথে নিয়ে যাওয়ার সিআরপিএফ-এর আবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কেন না-মঞ্জুর করল?

> **নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছেন, গোয়েন্দা দপ্তরের এত বড় ব্যর্থতা হল কী করে? এ কি ব্যর্থতা, নাকি পূর্বপরিকল্পনা প্রসূত? কাশ্মীর উপত্যকায় যেখানে প্রতিটি জেলা বা শহর শুধু নয়, প্রতিটি গ্রামেও আইবি, কাশ্মীর পুলিশের হাজার হাজার চর ছড়ানো রয়েছে। প্রতিটি গাড়ির গ্যারাজ, প্রতিটি মোবাইলের দোকান এই 'চরদের' নজর এড়িয়ে কিছু করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে কী করে পাচার হল তিনশো কেজি বিস্ফোরণ?**

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছেন, গোয়েন্দা দপ্তরের এত বড় ব্যর্থতা হল কী করে? এ কি ব্যর্থতা, নাকি পূর্বপরিকল্পনা প্রসূত? কাশ্মীর উপত্যকায় যেখানে প্রতিটি জেলা বা শহর শুধু নয়, প্রতিটি গ্রামেও আইবি, কাশ্মীর পুলিশের হাজার হাজার চর ছড়ানো রয়েছে। প্রতিটি গাড়ির গ্যারাজ, প্রতিটি মোবাইলের দোকান এই 'চরদের' নজর এড়িয়ে কিছু করতে পারে না। এমনকি প্রতিটি মুদির দোকানের ওপরেও শ্যেনদৃষ্টি থাকে গোয়েন্দাদের। কোনও বাড়িতে স্বাভাবিকের থেকে যদি দশ কিলো চালও বেশি যায়, সেই খবর পৌঁছে যায় গোয়েন্দাদের কাছে। কোনও বাড়িতে কোনও অতিথি এলে সেই খবর সঠিক সময়ে 'সঠিক' জায়গায় পৌঁছে যায়।

এই পরিস্থিতিতে কী করে পাচার হল তিনশো কেজি বিস্ফোরণ? গোয়েন্দা দপ্তর কি ঘুমিয়েছিল? নাকি তাদের ঘুমোতে বলা হয়েছিল? ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর চায়।

সুইপারদের সাফাই সরঞ্জামের জন্য বরাদ্দ ১১০ কোটি টাকা খরচই করেনি সরকার

রেললাইন, স্টেশন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর সহ শহরের নোংরা-আবর্জনা, বর্জ্য ইত্যাদি পরিষ্কার করেন যাঁরা তাঁদের পরিচিতি ধাঙড়, মেথর, ঝাড়ুদার, জমাদার ইত্যাদি নামে। বলতে গেলে, নগরজীবনকে দুর্গন্ধের, দূষণের কবল থেকে মুক্ত রাখেন তাঁরা। যাঁরা একদিন কাজ না করলে নগরজীবন বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায়, সেই মানুষরা তীব্র সরকারি বঞ্চনার শিকার। না আছে তাঁদের বাঁচার মতো মজুরি, না আছে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি। এমনকী সাফাই করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলিও ঠিকমতো সরবরাহ করা হয় না। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা কর্মরত থাকলেও তাঁদের স্থায়ীকরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবহেলিত।

যাঁরা এ পেশায় যুক্ত তাঁরা প্রায় সকলেই তথাকথিত নিম্নবর্ণ দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের এই বঞ্চানার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী বঞ্চনার সাথে জাতিবাদী বঞ্চনা মিশে রয়েছে। ফলে এঁদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকারি বা প্রশাসনিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না। দিনের পর দিন নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে এঁদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকেই নর্দমার বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সাফাই করতে গিয়ে সরকারি হিসাবেই— ২০১৫ সালে ৫৭ জন কর্মী, '১৬ সালে ৪৮ জন, '১৭ সালে ৯৩ জন, '১৮ সালে ৬৮ জন, '১৯ সালে ১১০ জন কর্মী মারা গেছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষার আধুনিক পদ্ধতি মেনে যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হলে এভাবে এতগুলি মানুষের প্রাণ যেত না।

খালি হাতে সাফাই নিষিদ্ধ করে ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এ কাজ আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে করাতে হবে। কিন্তু সেই আইনে বলা হয়নি, আইনভঙ্গ করলে কী শাস্তি হবে? এই না বলা কি ভুল করে, না কি সচেতনভাবে? স্বাভাবিকভাবেই আইনের কোনও প্রয়োগ হয়নি। ২০১৩ সালে এই আইনের সামান্য অদল-বদল করে 'প্রোহিবিশন অব এমপ্লয়মেন্ট অ্যাজ ম্যানুয়াল স্ক্যাভেনজার্স অ্যান্ড দেয়ার রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয়। বলা হয়, যাঁরা খালি হাতে সাফাইয়ের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করবে তাদের হয় এক বছর জেল বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হবে। কিন্তু আইন পর্যন্তই সার। কোনও সরকারই তা প্রয়োগ করল না।

এই আইন প্রণয়নের পর গত চার বছরে অবৈধভাবে কাজ করানোয় ৩৭৬ জন কর্মী মারা গেলেও কোনও নিয়োগকারীরই সাজা হয়নি। এই সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। বিভিন্ন রাজ্যেও তারা ক্ষমতায়। কিন্তু তাদের পরিচালিত কোনও সরকারই সুইপারদের এই সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'সুইপারদের কাজের নানা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। এজন্য বরাদ্দ করেছিলেন ১১০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও যন্ত্রই সরবরাহ করা হয়নি। সদ্য পেশ করা বাজেটেও তিনি একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একই পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করেছেন যন্ত্রীকরণের জন্য। এবারের প্রতিশ্রুতিও কি হবে একইরকম অন্তসারশূন্য?

বিজেপি শাসনে দলিতদের উপর অত্যাচার নানাভাবে বেড়েছে বহুগুণ। খুন, ধর্ষণ, সম্পত্তি লুঠ, অগ্নি সংযোগ সবই বেড়ে চলেছে। সুতরাং আইনি সুরক্ষা দিতে হলে, জাতপাতের রাজনীতি থেকে সরকার ও প্রশাসনকে মুক্ত করতে হবে। এরই সঙ্গে চাই সাফাই কর্মীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন। বরাদ্দ ১১০ কোটি টাকা দিয়ে আধুনিক সাফাই সরঞ্জাম সরবরাহের দাবিতে কর্মীদের আন্দোলনই পারে স্থবির এ সরকারকে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে।

উচ্ছেদ বন্ধ ও লাইসেন্সের দাবিতে আন্দোলনে হকাররা

২০ জানুয়ারি জাতীয় হকার দিবসে অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির ডাকে কলকাতা রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের জমায়েত থেকে রাজ্যপাল, রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত নগরউন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সমাবেশের জন্য প্রয়োজনীয় দরখাস্ত জমা দেবার পরও শেষ মুহূর্তে পুলিশ জানায় যে রানি রাসমণিতে তারা কোনও জায়গা দিতে পারবে না। এমনকি কলকাতা কর্পোরেশন বা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সামনে, মৌলালি, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার বা বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় কোথাও জমায়েত করার অনুমতি দেয়নি। সমন্বয় কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক কমরেড শান্তি ঘোষ এর তীব্র প্রতিবাদ করে ধিক্কার জানান। তিনি দাবি করেন অবিলম্বে রাজ্যে হকারবিধি প্রণয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪০ শতাংশ হকার ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করে হকারদের ভেন্ডিং লাইসেন্স দিতে হবে। হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। হকার পরিবারের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার হকার আইন ২০১৪প্রণয়ন করলেও যেভাবে রেল এলাকাকে হকার আইনের বাইরে রেখে রেল পরিষেবায় আরসিটিসি-র মতো বৃহৎ পুঁজির প্রবেশের পথ করে দিয়েছিল, তার তীব্র প্রতিবাদ করে রেল হকারদের হকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান তিনি।

সিএএ-এনআরসি-এনপিআর-এর বিরুদ্ধে

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিশাল কনভেনশন

১২ফেব্রুয়ারি জয়নগর ১নং ব্লকের বহড়ু স্কুল মাঠে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানা স্তরের প্রায় ৮ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সভাপতি

রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, আসামের নাগরিকত্ব সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটির তরফে সুরত জামান মণ্ডল, মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস, কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক গোর্কি চক্রবর্তী, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য রইস আলি বৈদ্য, অধ্যাপক জাহান আলি পুরকাইত প্রমুখ ব্যক্তিরা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মনোজ গুহ।

বিমল চ্যাটার্জী বলেন, 'আমরা ভারতের নাগরিকরা কবার নাগরিকত্বের প্রমাণ দেব? ১৯৫১ সালে একবার দিয়েছি, এখন বিজেপির সরকার এই প্রমাণ দিতে বলছে, আর একটা দলের সরকার আসবে, তারাও দিতে বলবে। আমরা বারবার এই কাজ করব না। এরা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন চাইছে, আমরা তা প্রতিহত করব। আজ পর্যন্ত ভারতের ১১টি রাজ্য এর বিরোধিতা করেছে। এই রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ। ক্রমাগত আরও বহু মানুষ প্রতিদিন যোগ দিচ্ছেন। আমাদের উদ্দেশ্য, ধর্ম বা অন্য যে কোনও প্রকারের বিভাজন বন্ধ করা'। সুরত জামান মণ্ডল বলেন, 'আসামে ২০১৫ সাল থেকে এনআরসি-র কাজ শুরু হয়। একটি বামপন্থী দল ছাড়া বাকি সবাই তা সমর্থন করে'। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষ জায়গা-জমি, ঘটি-বাটি, গরু-ছাগল বিক্রি করে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য দপ্তরে দপ্তরে ছুটছেন। যাঁদের নাম বাদ গেল তাঁদের অবস্থা কী? আরএসএস-বিজেপি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছিল, কোনও হিন্দুর ভয় নেই, অথচ ১২ লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ গেল বিজেপির সরকার থাকা সত্ত্বেও। ওদের উদ্দেশ্য কি নাগরিকত্ব দেওয়া? ওদের উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিককে নাগরিকত্বহীন করে দেওয়া'। তিনি আরও বলেন, 'আসামের অবস্থা ভয়ঙ্কর। ডিটেনশন ক্যাম্পে চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। কোনও মানবাধিকার সংগঠনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ২৯ জন ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। গরিব মানুষরাই এর শিকার হচ্ছেন। সুজাত ভদ্র বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আসামে এসেছে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা একেবারে সত্য নয়। তিনি বলেন, 'ডিটেনশন ক্যাম্পে একটি পরিবারের মহিলা-শিশুদের আলাদা করে রাখবে? এ তো নারকীয় ব্যাপার! এনআরসি-এনপিআর করতে এলে আপনারা কোনও কাগজ দেখাবেন না'। অধ্যাপক গোর্কি চক্রবর্তী বলেন, 'এনপিআর হল এনআরসি-র মাসতুতো ভাই। আসামে বলার চেষ্টা হয়েছিল, এনআরসি হলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। কী হয়েছে আমরা দেখছি। ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়নেই'।

গোপাল বিশ্বাস সারা রাজ্যের সঙ্গে এই জেলার প্রান্তে প্রান্তে এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কনভেনশনে অধ্যাপক মনোজ গুহকে সভাপতি এবং আনসার শেখ ও জ্ঞানতোষ প্রামাণিককে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৯০ জনের একটি শক্তিশালী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

সপ্তাহ জুড়ে অবস্থান কোচবিহারে

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি কোচবিহার জেলার পক্ষ থেকে রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ারে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সামনে ১০-১৪ ফেব্রুয়ারি অবস্থান-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এনআরসি ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান-আবৃত্তি-পাঠ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হীন উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়।

বক্তব্য রাখেন কমিটির সম্পাদক শিক্ষক সৌমিন্দ্র চন্দ্র দাস, প্রাক্তন সাংসদ দেবেন্দ্র নাথ বর্মন, অসিত দে, নেপাল মিত্র প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি আইনজীবী কিশোরানন্দ ভট্টাচার্য, শিক্ষক অহিদুল হক মিঞা। বিভাজন সৃষ্টিকারী এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিল এর দাবিতে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পুরুলিয়া জেলা কনভেনশন

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে নাগরিকত্ব হরণ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী এনআরসি, সিএএ,

এনপিআর প্রতিরোধে ৯ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া শহরে জে কে কলেজ রোডের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক কনভেনশন। কনভেনশনে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শতাধিক নাগরিক। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সভাপতি সৌরভ মুখার্জী। এনআরসির বিরুদ্ধে পুরুলিয়া জেলা জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে অ্যাডভোকেট পিনাকীরঞ্জন রক্ষিতকে সভাপতি এবং স্বদেশপ্রিয় মাহাতকে সম্পাদক করে ৪৪ জনের পুরুলিয়া জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কনভেনশন

এনআরসি, এনপিআর এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে ১১ ফেব্রুয়ারি জেলা নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন আহ্বান করেন অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি, জাতীয় শিক্ষক ডঃ সোমনাথ মিশ্র, ডঃ আব্দুল মতিন সহ দেড় শতাধিক অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী প্রমুখ। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন হেয়াতুল হোসেন। বক্তব্য রাখেন কমিটির উপদেষ্টা শংকর ঘোষ, আদিবাসী উন্নয়ন গবেষক অধ্যাপক ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, সমাজকর্মী জীবন দাস প্রমুখ।বিভিন্ন স্তরের সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সেক আব্দুল রহিমকে সভাপতি ও মানস প্রধান ও আব্দুল মাসুদকে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

তমলুকে বিশাল সমাবেশের একাংশ

কৃষ্ণনগরে চিটফান্ড-প্রতারিতদের মিছিল

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নদিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ৩ ফেব্রুয়ারি চিটফান্ড এজেন্ট ও আমানতকারীদের টাকা ফেরত এবং এজেন্টদের সুরক্ষা সহ ৬ দফা দাবিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী। সভার শেষে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে পোস্ট অফিস মোড় হয়ে রেল স্টেশন পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ইব্রাহিম বিশ্বাস।

ত্রিপুরা ঃ মিড ডে মিলের বেসরকারিকরণ বন্ধের দাবি

৬ দফা দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখা প্রাথমিক শিক্ষার ডিরেক্টরের নিকট ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবি— প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করতে হবে, টেট উত্তীর্ণদের চাকরি দিতে হবে, বেসরকারি সংস্থাকে মিড ডে মিলের বরাদ্দ দেওয়া চলবে না। নেতৃত্ব দেন সভাপতি সুভাষকান্তি দাস এবং সম্পাদক অসিত দাস।

ডিওয়াইওর উদ্যোগে বেলদায় খেলাধূলা

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৯

ফেব্রুয়ারি দেউলি শিবালয় মন্দির প্রাঙ্গণে। আটটি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শুরুতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে তাঁর জীবন ও কাজ স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপনেশ দে, প্রধান শিক্ষক সূর্যকান্তি নন্দ, সৌমেন বাগ, প্রদীপ মাজি, যুব সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুশান্ত পানিগ্রাহী, যুব নেতা সূর্য পড়্যা সহ অনেকেই। দেউলি যুবতীর্থ ক্লাব ও দাঁতনের বামনদা ক্লাবের মধ্যে ফাইনাল হয়। দেউলি জয়লাভ করে। তাদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক দলের হাতে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়।

ধরে ধরে জেলে পুরলেই কাশ্মীর সমস্যা মিটবে?

জঙ্গি সংগঠনের ভোট বয়কটের হুমকি সত্ত্বেও মানুষকে ভোট দিতে বলা কি অপরাধ? বেশি ভোট পাওয়া, তাও কি অপরাধ? মানুষ তাঁর কথা শোনে এটাও কি অপরাধ? এমন অপরাধের কথা কেউ শুনেছে কোনও দিন! কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে বিজেপি নেতারা মনে করেন এ সবই হল মারাত্মক অপরাধ। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে বিনাবিচারে আটক রাখতে জন নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ঠিক এই অভিযোগগুলিই তুলেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতির বিনাবিচারে আটকের ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে তাঁদের উপর জন নিরাপত্তা আইন (পিএসএ) প্রয়োগ করেছে সরকার। যার ফলে এঁদের বিনা বিচারে দু'বছর পর্যন্ত সরকার আটক রাখতে পারে। এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে ডাহা মিথ্যে বলেছিলেন। তিনি বলেন, প্রবীণ সাংসদ এবং রাজ্যের ৫ বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে আটক করাই হয়নি। অথচ ফারুক আবদুল্লা ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বাতিলের দিন থেকেই বন্দি। শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলার অল্প কিছু পরেই ফারুক আবদুল্লার ওপর পিএসএ প্রয়োগ করে সরকার। ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতিদের এতদিন সাধারণ নিবর্তনমূলক (প্রিভেন্টিভ) আটক আইনের ভিত্তিতে গৃহবন্দি রাখা হয়েছিল। কিন্তু ৬ মাস ধরে কোনও আদালতে তাঁদের হাজির করা হয়নি। নিবর্তনমূলক আইনে তাঁদের আর আটক রাখা যাবে না বুঝেই পিএসএ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন জম্মু কাশ্মীর প্রশাসন যে বয়ান দিয়েছে, তাতে লেখা হয়েছে, আটক ব্যক্তি এমন একজন লোক, যিনি ডাক দিলে জঙ্গিদের ভোট বয়কটের ডাক উপেক্ষা করে দলে দলে লোক ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। বলা হয়েছে, এই আটক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেন। তিনি ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরোধিতা করেছেন, টুইটারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়েছেন এবং অশান্তিতে ইন্ধন দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ওমর আবদুল্লার আটক হওয়ার আগে ৪ এবং ৫ আগস্ট ২০১৯-এর শেষ যে কটি টুইটার মন্তব্য সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করেছে, তার সবকটিতেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন— কাশ্মীরকে ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকার গোপনে কিছু একটা করতে চাইছে। যাই ঘটুক না কেন কাশ্মীরের মানুষ যেন শান্ত থাকেন, প্রতিবাদ যেন হিংসাত্মক না হয়, হিংসাত্মক প্রতিবাদে লাভ বিজেপিরই হবে। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১০.০২.২০২০) এর কোনটিকে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা বলে অমিত শাহরা মনে করছেন, তার কোনও ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি।

গণতন্ত্রের কী অপূর্ব নমুনা! অমিত শাহরা মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, এর মধ্য দিয়ে একটা কথা তাঁরা পরিষ্কার মেনে নিয়েছেন, কাশ্মীরের মানুষ তাঁদের কথা শোনেন না। তাঁরা সারা কাশ্মীরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, মানুষের চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছেই। ৬ মাস পর আংশিকভাবে ফোন-ইন্টারনেট খুললেও তা এখনও পুরোপুরি চালু নয়। সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য খবর করলেই বর্ষীয়ান সাংবাদিকদের পর্যন্ত তুলে নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করছে পুলিশ। যে সমস্ত দলগুলি ভারতের সংসদীয় ভোট রাজনীতিতেই আছে, তাদের নেতারাও বন্দি। এমনকি যে মেহবুবা মুফতি কাশ্মীর রাজ্যে বিজেপির সাথে কোয়ালিশন সরকার চালিয়েছেন মাত্র কিছুদিন আগেই, তাঁকেও বিপজ্জনক ব্যক্তি বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার! আরও হাস্যকর হল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগে লিখেছে 'ড্যাডিস গার্ল' অর্থাৎ বাপকা বেটি। কে সেই পিতা? তিনি হলেন বিজেপি সমর্থিত ভিপি সিং সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সইদ। মেহবুবা মুফতি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, তিনি সারা দেশে গণপিটুনিতে হত্যা নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেছেন। সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল, স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টও এই সমালোচনাটি একাধিকবার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নীতির বিরুদ্ধতা করা যাবে না, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা যাবে না, সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা সরকারের কাছে জানাতে পারবেন না এটাই কি কাশ্মীরের স্বাভাবিকত্ব? অবশ্য কাশ্মীর কেন, আজ সারা ভারতেই বিজেপি সরকার এই 'গণতন্ত্রের' নমুনাটিকেই তো প্রয়োগ করে চলেছে! বিজেপির কিংবা সরকারের বিরুদ্ধতা মানেই দেশদ্রোহিতা, এই দর্শনেই তো তাঁরা বিশ্বাসী। তাইতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিজেপি নেতারা বিরোধীদের গুলি করার কথা বলে চলেছেন। আর সেই নির্দেশ মেনে একের পর এক বিজেপি ভক্ত নাথুরাম গডসে হওয়ার বাসনায় খোদ দিল্লিতে পর্যন্ত প্রতিবাদী মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ তো অলিখিত 'পুলিশি রাজ' জারিই করে দিয়েছে। সেখানে বিক্ষোভ করলেই গুলি চলছে। দিল্লির বুকে যে কোনও প্রতিবাদকে দমাতে কাশ্মীরের কায়দাতেই এনএসএ অর্থাৎ নির্বিচারে আটকের আইন জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা বলেছিলেন তাঁরা কাশ্মীরকে ভারতের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছেন। কাশ্মীর সহ সারা দেশে একই কায়দায় গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরাই কি সেই মিলনের পথ! অমিত শাহরাই উত্তর দিতে পারেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হতে পারে যেন এতদিন কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না! কাশ্মীরের জনগণই তো স্বায়ত্তশাসনের সীমিত অধিকারের ভিত্তিতে ভারতভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করে সংবিধানসম্মত ভাবে তা আদায় করেছিলেন। বিজেপি সরকারের একতরফা গা-জোয়ারি সিদ্ধান্ত তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে মারাত্মক আঘাত করেছে। এর উপর কাশ্মীরের মানুষ দেখছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাজানো সফরে বিদেশি প্রতিনিধিরা কাশ্মীর ঘুরে আসছেন, অথচ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিংবা ভারতীয় পার্লামেন্টের কোনও বিরোধী দলের সদস্য কাশ্মীরে পা রাখার অনুমতিও পাচ্ছেন না। কাশ্মীরের সাংসদ ফারুক আবদুল্লা বন্দি, তিনি সংসদে আসার অনুমতিটুকুও পাচ্ছেন না। এগুলোই আসলে কাশ্মীর তথা বিজেপি শাসিত ভারতে 'স্বাভাবিক'! এটাই বিজেপি শাসনের 'গণতন্ত্র'!

আর একটি তথ্য আরও চমকপ্রদ। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের ভারতীয় কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী প্রবাসী কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ইজরায়েল প্যালেস্টাইনে অধিকার

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার প্রতিবাদে
দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত গার্গী কলেজে বার্ষিক উৎসব চলাকালীন বহিরাগতদের হামলা ও ছাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ এবং জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপর বর্বর পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও এবং এ আই এম এস এসের উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র দিল্লি রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড প্রশান্ত কুমার এবং এ আই এম এস এসের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সীতা সিং। তাঁরা বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা নিবারণে কোনও তৎপরতা তো দেখায়নি, বরং সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কাছেই থাকা পুলিশ বাহিনীও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁরা বলেন, এই যদি রাজধানী দিল্লির অবস্থা হয়, তা হলে দেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তে মহিলাদের নিরাপত্তার অবস্থা কেমন তা সহজেই বোঝা যায়।

আমেদাবাদে মহিলা বিক্ষোভ

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ দ্বিতীয় দফায় হামলা চালিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উপর এই পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং দিল্লির গার্গী কলেজে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে এ আই এম এস এস গুজরাট রাজ্য কমিটি ১১ ফেব্রুয়ারি আমেদাবাদে বিক্ষোভের ডাক দেয়। সংগঠনের রাজ্য কনভেনর মীনাক্ষী যোশী জানান নিরাপত্তার অজুহাত তুলে পুলিশ বিক্ষোভের অনুমতি বাতিল করে দেয়। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তা হলে কার নিরাপত্তার কথা বলছে?

কলকাতায়
বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানোর দাবিতে আন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে ১৫ ফেব্রুয়ারি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা জেলা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরি। তিনি জানান, অন্যান্য দাবিগুলির সাথে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিলের দাবিতেও তাদের আন্দোলন চলছে। নীরেন কর্মকার সম্পাদক এবং শিবাজী দে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গুজরাটের আমেদাবাদের সর্দারবাগে ১৫ ফেব্রুয়ারি এসইউসিআই (সি) সহ বামপন্থী দলগুলির যৌথ বিক্ষোভ

পাঠকের মতামত

জিডিপি-র নিরিখে শিক্ষা বরাদ্দ কমাল বিজেপি

সর্বকালীন দীর্ঘ বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২০-২১ সালের যে বাজেট সংসদে পেশ করেছেন তা সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী। তিনি শিক্ষায় ৯৯,৩১১কোটি টাকা এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। শিক্ষায় গত অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় এ বছর বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে ৪৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু ৪ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি ধরলে এই বৃদ্ধি সামান্য। টাকার পরিমাণে বরাদ্দ বেশি হলেও বাস্তবে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বাড়েনি। এই বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ০.৪৪ শতাংশ, যেখানে গত বছর তা ছিল ০.৪৫ শতাংশ। আর ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে ২০১৪-১৫ সালে তা ছিল ০.৫৩ শতাংশ। তারপর থেকে তা ক্রমশই কমেছে।

মোট খরচের হিসাবেও শিক্ষায় বরাদ্দ কমেছে। ২০১৪-১৫ সালে তা ছিলমোট খরচের ৪.১৪ শতাংশ। আর এ বছর তা কমে হয়েছে ৩.২৬ শতাংশ। শিক্ষাবিদদের দাবি শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ১০ শতাংশ করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে আসীন কোনও সরকারই সে দাবি মানেনি। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উচ্চমানের শিক্ষা দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ তাঁর সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন নতুন শিক্ষানীতি শীঘ্রই চালু করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে খরচ মোট সরকারি খরচের ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করতে হবে। অথচ এবারের বাজেটে যে অর্থ শিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়েছে তা এর ধারে কাছেও নেই। এর কারণ সরকার শিক্ষার ব্যয় বহনের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে। যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চলেছে তা শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সেইসঙ্গে জনহিতকর সংস্থা ও কর্পোরেট হাউসগুলিকে শিক্ষায় অর্থব্যয় করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এটা অবশ্য প্রথম নয়। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব অস্বীকার করে বলে সরকারের পক্ষে শিক্ষার সব ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষানীতিও সেই পথেই চলেছে। কাজেই এই শিক্ষানীতি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে না, করবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসের।

উচ্চমানের শিক্ষা দেবার উদ্দেশে এই বাজেটে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করা যায়। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের আশঙ্কা এর ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রটি বিদেশি পুঁজির মুনাফার বাজারে পরিণত হবে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার ব্যয়ভার এত বৃদ্ধি পাবে যে শিক্ষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। বাজেটে অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শ্রেণি কক্ষে ছাত্র- শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত হবে। তাছাড়া এর দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষক নিয়োগ করার দায়িত্ব থেকে সরকার অব্যাহতি নিতে চাইছে। আর যেখানে দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে সেখানে অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবে। এই বাজেটের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নিয়োগযোগ্যতাকে সংযুক্ত করা। অর্থাৎ সরকারের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে চাকরির উপযুক্ত করা। চাকরির নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি না করে এসব কথা বলার অর্থ কী? বাস্তবে এর দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে 'ম্যান-মেকিং ক্যারেকটার-বিল্ডিং' তা অস্বীকার করা হচ্ছে না কি ? একজন ছাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক মানুষ হোক, উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সন্ধান পাক, পশ্চাৎপদ চিন্তা ও অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত হোক এটাতেই কি জোর দেওয়া জরুরি ছিল না?

ডঃ প্রদীপ কুমার দত্ত

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন

একের পাতার পর

হয়ে ওঠে শাহিনবাগ। তাঁরা নির্বিচারে আক্রমণ শুরু করেন শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের। বলতে থাকেন, শাহিনবাগে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁরা পাকিস্তানি। কোনও কোনও নেতা বললেন, এঁদের কারও কাগজ নেই। এঁরা সব বাংলাদেশি। কেউ বললেন, এঁরা দেশকে ভাঙতে চায়। সব দেশদ্রোহী। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বললেন, দেশ কে গদ্দারো কো, গোলি মারো শালোঁ কো। দিল্লির সাংসদ প্রবেশ বর্মা শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে বলে দিলেন, "এরা ঘরে ঢুকে আপনাদের মেয়ে-বোনকে ধর্ষণ করবে।" বললেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে শাহিনবাগ খালি করতে এক ঘণ্টাও লাগবে না।' নির্বাচনকে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ হিসাবে দেখাতে আপ থেকে বিজেপিতে যাওয়া নেতা কপিল মিশ্র বললেন, এটা আসলে 'ভারত-পাকিস্তান মোকাবিলা'। প্রধানমন্ত্রী কিংবা অমিত শাহ সেদিন এঁদের কাউকে বলেননি, যে এমন বক্তব্য অনুচিত। বলেননি যে এর দ্বারা রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত হয়। গণতন্ত্রে বিরোধী মতপ্রকাশের যে অধিকার রয়েছে তাকে দমন করা হয়। অবশ্য অমিত শাহরা তাঁদের সংযত করবেন কী করে— তিনি তো নিজেই প্রচারে বলেছিলেন, এত রাগে ইভিএমের বোতাম টিপুন যেন কারেন্ট লাগে শাহিনবাগে।' ফলে কুকথা বলা উচিত না অনুচিত তা বলার কোনও অধিকারই তাঁর নেই। কারণ তিনিও সমান অপরাধে অপরাধী। তা ছাড়া মূল্যায়নে ভুলের যে কথা তিনি বলেছেন তাও সত্য নয়। কারণ এটা ভুলের বিষয়ই নয়। যখন তাঁরা বুঝেছিলেন মানুষকে তাঁদের বলার কিছু নেই, তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন যে, শাহিনবাগকেই তাঁরা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করবেন। সাম্প্রদায়িক প্রচারকেই তাঁরা একমাত্র হাতিয়ার করবেন। মেরুকরণকেই গোটা দল একমাত্র অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে।

অথচ অমিত শাহরা পরিষ্কার জানতেন, শাহিনবাগের অবস্থানকারীরা কারা। কী তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের দাবি এবং পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক তা-ও বিজেপি নেতাদের অজানা ছিল না। কিন্তু যে উদ্বেগ-আতঙ্ক থেকে দু'ডিগ্রি তাপমাত্রার শীতে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে কোনও মা দিন-রাত খোলা আকাশের নিচে কাটাতে পারেন তা উপলব্ধি করার জন্য রাজনীতির মধ্যে যে নৈতিকতা, যে সংবেদনশীলতা থাকা দরকার তা অমিত শাহদের রাজনীতিতে নেই। এই অবস্থানেই দিনের পর দিন কাটানো এক শিশুর ঠাণ্ডা লেগে মৃত্যুর ঘটনা কারও অজানা নয়। তারপরও সন্তানহারা মা বলেছেন, আমার অপর সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমি আবারও যাব অবস্থানে। সংগ্রামী মাতৃত্বের এই মনোভাবকে সারা দেশ কুর্নিশ জানিয়েছে। শুধু বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ বিজেপি নেতাদের মনেই তা কোনও দাগ কাটতে পারেনি।

শুধু তো শাহিনবাগের মানুষই নন, সিএএ-এনআরসির বিরোধিতায় সোচ্চার আজ সমস্ত স্তরের মানুষ। ছাত্ররা বেরিয়ে আসছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যাঁরা সাধারণত নিজেদের পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সেই শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকর্মী সাংবাদিক শিক্ষক চিকিৎসক বুদ্ধিজীবীরাও প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। একের পর এক রাজ্যে বিধানসভায় পাশ হচ্ছে সিএএ-এনপিআর বিরোধী প্রস্তাব। মুখ খুলছেন বিচারপতিরা। বলছেন, সরকারি আইনের প্রতিবাদ করা মানুষের ন্যায্য অধিকার। গায়ের জোরে কোনও সরকার তা কেড়ে নিতে পারে না।

দেশ জুড়ে মানুষের এই আতঙ্ক-উদ্বেগকে শুধুমাত্র সরকারি ক্ষমতার ঔদ্ধত্যেই উড়িয়ে দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। তাঁদের রাজনীতির মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের কোনও জায়গা নেই, তাঁদের রাজনীতি শুধুই ক্ষমতা দখলের উপায়। তাই এই রাজনীতিতে জেতাটাই শেষ কথা। ক্ষমতা দখলটাই শেষ কথা। তাই কুলদীপ সেঙ্গারের মতো উন্নাওয়ের শিশুঘাতী, ধর্ষকরা অনায়াসেই দলে নেতা বলে জায়গা পেয়ে যায়। মালেগাঁও বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞার মতো মহিলা দিব্যি সাংসদ হয়ে সমাজে বিভাজনের বিষ ছড়াতে থাকেন।

অমিত শাহ দাবি করেছেন, দিল্লি নির্বাচনে এই শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গে সিএএ-প্রতিবাদের কোনও যোগ নেই। এর দ্বারা মানুষের রায়কে ঢাকতে চাইছেন। যদি তাঁরা জিততেন তা হলেও কি এ কথা বলতেন? তখন কি বলতেন না, এই ফল বাস্তবে সিএএ-র পক্ষে রায়। তা হলে এখন কেন তাঁরা এটা মেনে নেবেন না যে, এই রায় আসলে সিএএ-এনআরসির বিরুদ্ধে জনগণের রায়? অমিত শাহ মুখে যা-ই বলুন, তাঁরা নিজেরা জানেন, কারা সরকার গড়বে এটা যেমন এই নির্বাচনের বিচার্য বিষয় ছিল, তেমনই বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকে মানুষ সমর্থন করছে কি না, তারও পরীক্ষা ছিল এই নির্বাচন। ফল থেকে স্পষ্ট, মানুষ দিল্লির সরকারে যেমন বিজেপিকে দেখতে চায়নি, তেমনই তাদের বিভাজনের রাজনীতিকে, এনআরসি-সিএএ চালুর কর্মসূচিকেও মানুষ প্রত্যাখান করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ-সমাজবিরোধীদের একতরফা আক্রমণকে। এই রায় দেশজুড়ে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করবে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষের মনোবল আরও বাড়িয়ে দেবে। বিজেপি সরকার যদি এর থেকে শিক্ষা নিয়ে সিএএ প্রত্যাহার না করে, তবে মানুষের আরও জোরালো প্রতিবাদের জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

কাশ্মীর

পাঁচের পাতার পর

কায়েমের জন্য যা করছে, সেই মডেলই অনুসরণ করতে হবে কাশ্মীরে (দ্য স্ক্রোল, ২৭ নভেম্বর ২০১৯)। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। একজন দায়িত্বশীল কূটনীতিক বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলার পর সরকার সেই বক্তব্য বাতিল না করার অর্থ এটাই ধরতে হবে যে, সরকারের মনোভাবের সাথে এ কথার মিল আছে। এই মনোভাব যে কাশ্মীর সমস্যাকে আরও জটিল করবে তা একটা শিশুও বোধহয় বোঝে। সরকার না চাইলে এই ধরনের মন্তব্য কি সরকার চলতে দিত ? আসলে সমস্যার সমাধান নয়, সরকার তথা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে 'কাশ্মীর' হল সারা দেশে ছদ্ম-জাতীয়তাবাদী আবেগের ঢেউ তুলে ভোট জোগাড়ের হাতিয়ার মাত্র!

গত বছর ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে একতরফাভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল করার পরমুহূর্ত থেকেই তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ বহু মানুষকে আটক করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ীই এই সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ১৬১ জন। যদিও বেসরকারি মতে বেআইনি ভাবে কোনও লিখিত তথ্য না দিয়ে অজানা জায়গায় আটক করে রাখা মানুষের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে ১০ বছরের স্কুল ছাত্র থেকে শুরু করে অতিবৃদ্ধ মানুষ পর্যন্ত আছেন। অনেককে কাশ্মীরের বাইরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলে বন্দি অবস্থায় ক্যান্সার আক্রান্ত কাশ্মীরি নেতার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর ছররা গুলিতে, লাঠির আঘাতে মৃত্যু ঘটেছে একাধিক। সরকার ডেথ সার্টিফিকেটটা পর্যন্ত আটকেছে। এগুলো কোন স্বাভাবিকতার লক্ষণ? কাশ্মীরের ফল চাষ, পর্যটন শিল্প থেকে শুরু করে শাল কিংবা কার্পেট ব্যবসা মারাত্মক সংকটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ রুজিরোজগারহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শিশু-কিশোররা স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে। তারা ভয়জনিত ট্রমায় আক্রান্ত। এসব নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা কেউ দেখেছে?

যে পিএসএ আইন প্রয়োগ করা হল, তাকে ১৯৮২ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল 'ল লেস ল' বেআইনি আইন। ১৯৭৮ সালে জঙ্গলের কাঠ চোরদের দমনের অজুহাতে তা চালু হয়েছিল। এই স্বৈরাচারী আইনে এখনও পর্যন্ত ক'জন কাঠচোর গ্রেপ্তার হয়েছে তা হাতে গুনে বলে দেওয়া গেলেও রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর কতবার এই আইন প্রয়োগ হয়েছে তা গুনে শেষ করা মুশকিল (নিউজক্লিক, ২০ নভেম্বর ২০১৯)। আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে এত দমন পীড়ন সত্ত্বেও গলা টিপে ধরাকে গণতন্ত্র বলে মানানো যায়নি যেমন কাশ্মীরকে, তেমনই সারা দেশকে।

আজ কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ শুধু সে রাজ্যের মানুষের সমস্যা নয়। বিজেপি সরকার আজ সারা দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার হরণ করছে, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের সম্পদ কার্যত লুঠ করছে, দেশের মানুষের প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, এনআরসি-সিএএ-র মতো মারাত্মক জনবিরোধী আইন এনে দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন আনছে। প্রতিবাদ করলেই তাদের দেশদ্রোহী বলছে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যদি মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হয় তাহলে কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিকে সরিয়ে রেখে তা সম্ভব নয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি দমন-পীড়নের শিকার তাদের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই আছে সকল মানুষের অধিকারের কথাকে তুলে ধরার শক্তি। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের স্বার্থের দিক থেকে দেখলে কাশ্মীরের জনগণের কান্নার পাশে দাঁড়ানোর দায় আজ সারা দেশের খেটে খাওয়া মানুষেরই।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(৩০)

বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধি

ভারতবর্ষের অকল্পনীয় দুরবস্থা দেখে, তা থেকে দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" এই অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতেই তখন বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ধর্মীয় শাস্ত্রশাসনের জমাট অন্ধকার দূর করে আধুনিক শিক্ষার আলো ভারতীয় সমাজের সর্বত্র জ্বালাবার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই বিদ্যাসাগর গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক মানব সমাজের অগ্রগতির উৎস কোথায়। ধর্মীয় অন্ধতার বশবর্তী হয়ে মানুষের উপর মানুষের দমনপীড়ন বন্ধ না হলে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না কিছুতেই। তাই তিনি বললেন, "ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবে না।" (*সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*)। এখানে বিদ্যাসাগরের শব্দপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। তিনি বলছেন, 'ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক'। তিনি 'হিন্দু' বা 'ব্রাহ্মণ' বলেননি। দ্বিতীয়ত, 'সমূলে উন্মূলন' কথাটিও প্রণিধানযোগ্য। 'সমূলে উন্মূলন' অর্থাৎ, পুরোপুরি উচ্ছেদ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অন্য বক্তব্য, "পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া, সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভালো হয়।"

এ কথা লেখা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিস্পৃহ। জীবনের কোনও অবস্থাতেই তিনি ধর্মের আশ্রয় নেননি। তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ যে নিম্নবর্ণে মানুষদের অচ্ছুৎ করে রেখেছিল বিদ্যাসাগর তাদের কথা ভেবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এদেশের নিম্নশ্রেণির গতি না ফিরিলে দেশের গতি ফিরিবে না।" তাই, তিনি তাদের নিছক সেবা করেননি। নিম্নবর্ণের অসহায় বৃদ্ধ মহিলার রুক্ষ্ম চুলে তিনি নিজে হাতে তেল মাখিয়ে দিয়ে বাস্তবে এক মহতী আন্দোলনের সূচনা করেছেন। সমাজের নীচুতলার মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম দরদবোধ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি অকাতরে ভালবেসেছেন। যেখানে সম্ভব হয়েছে তাদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন এবং নিজের টাকা দিয়ে সেগুলোর খরচখরচা সমস্ত বহন করেছেন।

সেই যুগে দাঁড়িয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের আজীবনের লড়াই কি শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কথা ভেবে? এই অমানবিক প্রথার শিকার কি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল না? এর শিকার কি মুসলিমরা ছিল না? এই নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজপতিদের মুখ বন্ধ করার জন্য। কারণ, প্রধান বাধা হিসাবে তারাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এই অংশে ধাক্কা দেওয়া ছিল অত্যন্ত জরুরি। কারণ, আর্থিক সঙ্গতি থাকায় মধ্যবিত্তরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নিতে পারে। সমাজ সম্পর্কে তাদের মতামত জনসমাজকে প্রভাবিত করে। কিন্তু নিছক শাস্ত্রীয় যুক্তি

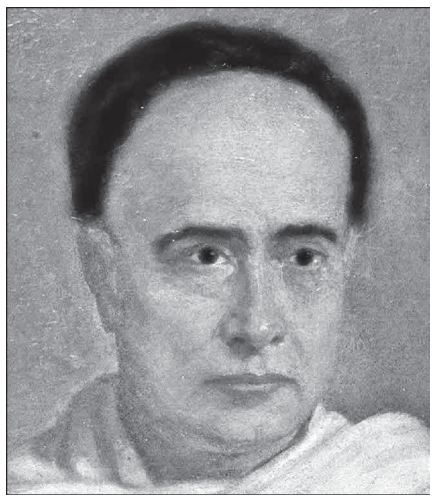

তাঁর লড়াইয়ের ভিত্তি ছিল না। সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লড়াই করার প্রশ্নে সচেতন ভাবেই শাস্ত্রকে তিনি মূল ভিত্তি করেননি। কারণ, সমস্যাটা শুধু হিন্দুদের ছিল না। লড়াইয়ে তাঁর ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান— শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব। সেই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই বিদ্যাসাগর মানুষের হৃদয়ের দরবারে আবেদন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য, বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদেশীয় (লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর 'হিন্দুদিগের' বলেননি।) বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, ... কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায়দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণীয় ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।" এছাড়া, বিবাহের বয়স নির্ধারণেও তিনি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান নিয়ে যুক্তি তোলেন।

বিধবাবিবাহের সমস্যা মুসলিম সমাজে ছিল না। মূলত হিন্দুসমাজকেই তা বিপন্ন করে রেখেছিল। যদিও, নিম্নবর্ণের নারীর বিধবাবিবাহ বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের লড়াইয়ের মূল ভিত্তি ছিল ধর্মনিস্পৃহ মানবতা। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিসীম সাহসিকতা এবং মুক্ত মনের সাথে মানবতার দরবারে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, "বিধবা হওয়া মাত্রই নারীর দেহ পাষাণবৎ হইয়া যায় না।" দেশে দেশে যুগ যুগ ধরে অবদমিত নারীর মানবাধিকার নিয়ে তাঁর আগে আর কে এভাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন? তা ছাড়াও, ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখার ফলে সমাজে কী ব্যাপক পরিমাণে ব্যাভিচার ও কন্যাভ্রূণ হত্যা বাড়ছে সেই দিকে বিদ্যাসাগর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটা পুরোপুরি সামাজিক সমস্যার ব্যাপার, এর সাথে ধর্মের বা জাতপাতের কোনও যোগ নেই— বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল এটাই।

বহুবিবাহ কু-প্রথার মারাত্মক প্রভাব গোটা দেশেই ছিল। এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সে-সময়ে প্রবলভাবে যুক্তি তোলা হয়েছিল যে, বহুবিবাহ বন্ধ করলে হিন্দু ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে। এই অসত্য প্রচারের বিরোধিতা করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বই লিখেছিলেন। নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রীতিমতো সমীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছিলেন, "বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকাতে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য অংশে তত নয়, এবং বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেরূপ দোষ বা অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না।" কিন্তু বহু বিবাহ প্রথা রদ করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভিত্তি হিসাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "যাঁহারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রী জাতির দুরবস্থা বিমোচন ও সমাজের দোষ সংশোধন ভিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই।" লক্ষণীয়, তিনি 'হিন্দু রমণীর' বলেননি, বলেছেন 'স্ত্রী জাতির'। সহবাস সম্মতি আইন প্রসঙ্গেও বিদ্যাসাগরের যুক্তিধারা ছিল সম্পূর্ণ শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক, কোনও ধর্মীয় ব্যাপার ছিল না।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা-ই করেছিলেন। বরং ধর্মের প্রশ্ন যাতে সামনে না আসে সেজন্য বিদ্যাসাগর লিখিতরূপে বলেছিলেন, "শিক্ষার্থীদের ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কোনও অনধিকার চর্চা করা শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।" এর দ্বারা তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ জাতপাত নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকারের পথেই এগিয়েছেন, যা সে-সময়ের রীতি ছিল না। শিক্ষা এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়টা সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচা অনুসারে সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই আবদ্ধ ছিল। এই বাস্তবতাকে বিবেচনার বাইরে রাখলে বিদ্যাসাগরের যথার্থ মূল্যায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ কথা ঠিক যে, বিদ্যাসাগর সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেননি। সে সময় অন্য কে-ই বা তা করেছিলেন? এই বাস্তবতাটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, সেটা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ ছিল না। সেটা ছিল বহু যুগের অন্ধকার কাটিয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার, মানুষের মনন গড়ে তোলার যুগ। সেখানেই বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। তিনি নতুন মানুষ গড়ার ব্যবস্থা না করলে পরবর্তীকালে যে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেটার ক্ষেত্রে আরও দেরি হত। রাজনীতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত খুব বেশি জানা যায় না। তবুও কিছু কিছু ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মূলত সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী হওয়া সত্ত্বেও 'রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অনীহা ছিল' এ কথা ঠিক নয়। জানা যায়, কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষপর্যন্ত যদি দরকার হয় তবে তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে? কথাটা শুনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

বিদেশি প্রশাসনের বিরুদ্ধে সম্ভবত এদেশের প্রথম ছাত্র আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যাসাগরই করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্মগুরু বলে পরিচিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। সাহেব প্রিন্সিপ্যাল একদিন ভারতীয়দের সম্পর্কে অসম্মানসূচক মন্তব্য করায় ছাত্ররা ক্লাস বয়কট শুরু করে। বিব্রত ইংরেজ শাসকরা বিদ্যাসাগরকে বিষয়টা মীমাংসার ভার দেন। ধর্মঘটি ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাসাগরকে অপমানের বিষয় জানান। সমস্ত শুনে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। আন্দোলনরত ছাত্রদের বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি নিজে মাসের পর মাস বৃত্তির টাকা যোগান দেন। পরে প্রিন্সিপাল দুঃখ প্রকাশ করলে ছাত্ররা আন্দোলন প্রত্যাহার করে।

১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাশ করে ভারতে এসে সরকারি চাকরি গ্রহণ করে সিলেটের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রাজরোষে পড়েন। বিদেশি শাসকেরা তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় সরকারি প্রতিক্রিয়ার কোনো পরোয়া না করে বিদ্যাসাগর সুরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি দিয়েছিলেন।

নিজে সরাসরি যুক্ত না হলেও রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, ...অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। ...যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।"

স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, "কোন শিক্ষিত বাঙালী তৎকালে স্বাধীনতার মতবাদের আন্দোলন না করিত? বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুদের এই মতানুযায়ী কার্য করিতে বলিতেন। ...মেদিনীপুরের একটি স্কুলের একজন অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত ঁজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুও আমাকে... বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুদের বলিতেন, 'তোমাদের আর উপায় নেই। জঙ্গলে গিয়া পল্টন তৈয়ার কর। তিনি সময় সময় এত গরমভাবে কথা বলিতেন যে, বন্ধুরা তাঁহার ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিতেন।" ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। অত্যাচারি নীলকর মিঃ উডের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। রাগে বিদ্যাসাগর তার দিকে নিজের জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কোনও ধর্মের নন, কোনও গোষ্ঠীর নন। তিনি ধর্মনিস্পৃহ মানবতাবাদের প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্মপরিধি কোনও সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। তাঁর সমকালেই গোটা দেশে তিনি চিন্তার জগতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ একটি করে আন্দোলনের সূচনা করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক লড়াইকে অন্তত কিছুটা অনুধাবন করতে পারলে একুশ শতকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হতে পারে। (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিনিধিরা

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষায় বিদেশি লগ্নির ঘোষণার বিরুদ্ধে ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেয় অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি।

কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর, সহ সম্পাদক মৃদুল দাস, শিক্ষক শুভঙ্কর ব্যানার্জী এবং তপন চক্রবর্তী প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

শিশু পাচার, রায়গঞ্জ থানায় বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ডিএম বাংলোর পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের দুই শিশু সুনিরাম মুর্মু এবং বিশ্বনাথ কিস্কু সহ একজন প্রাপ্তবয়স্ককে গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামের জনৈক মফিজুউদ্দিন নিয়ে চলে যায়। তারপর তিনি ফিরে এলেও শিশুদের কোনও হদিশ দিতে পারেননি। প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও ওই শিশু দুটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, তাদের পাচার করে দেওয়া হয়েছে।

অপহৃতদের অবিলম্বে উদ্ধার করার দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি এসইউসিআই(সি) রায়গঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দেড় শতাধিক মানুষের এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেডস মাধবীলতা পাল, গোপাল দেবনাথ, শ্যামল দত্ত, রুবিনা খাতুন, শুক্লা বর্মন, বিপ্লব কর্মকার প্রমুখ। বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে আই সি রাস্তায় এসে দেখা করে শিশুদের উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে তারার বাড়িতে নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ি থানায় এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়

চেন্নাইয়ে মহিলা প্রতিবাদীদের উপর পুলিশি নির্যাতন

তীব্র নিন্দায় এ আই এম এস এস

চেন্নাইয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি সিএএ-এনআরসি-এনপিআর-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত মহিলাদের উপর পুলিশ যেভাবে আক্রমণ করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছেন এ আই এম এস এসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি। ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে পুরুষ পুলিশকর্মীরা মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। যার ফলে বহু মহিলা আহত। পুরুষ পুলিশকর্মীরাই ধাক্কা দিতে দিতে মহিলা বিক্ষোভকারীদের ভ্যানে তুলেছে। এট সম্ভব হতে পেরেছে কেবলমাত্র ফ্যাসিস্ট বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার তা চেয়েছে বলেই। তিনি তামিলনাড়ু সরকারের কাছে দোষী পুলিশ কর্মীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এই সময় সারা দেশে মহিলারা বহু অসুবিধা এবং বাধার মোকাবিলা করে যে অভূতপূর্ব সাহসী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এ আই এম এস এস তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সারা দেশের এই প্রতিবাদী মহিলাদের সাথে তামিলনাড়ুর আন্দোলনকারীদের পাশে এ আই এম এস এস সর্বদা থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কৃষক-খেতমজুরদের লাউদোহা ব্লক সম্মেলন

পশ্চিম বর্ধমানের তিলাবুনী গ্রামে ২ ফেব্রুয়ারি এআইকেকেএমএস-এর লাউদোহা ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার এ আইকেকেএমএস-এর সম্পাদক দনা গোস্বামী ও সভার সভাপতি মোজাম্মেল হক। এরপর প্রধান বক্তা এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ দেশের সামগ্রিক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। বিশেষ করে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর কীভাবে দেশের বেশিরভাগ মানুষকে রাষ্ট্রহীন, নাগরিকত্বহীন করে তুলবে এবং দেশের গরিব কৃষক, খেতমজুর, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন এর দ্বারা সব থেকে বেশি সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে তিনি তা ব্যাখ্যা করে দেখান। তাই এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলিকে নিয়ে ১ এবং ২ মার্চ সারা রাজ্যব্যাপী কিষান মার্চ-এ কৃষক ও খেতমজুরদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই (সি) জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ও লাউদোহা লোকাল সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী। কমরেড প্রভাতী গোস্বামীকে সভাপতি ও আব্দুল জলিলকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠন হয়।

চাকরি প্রার্থীদের উপর পুলিশি হামলা প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে পুলিশ যেভাবে গ্রেপ্তার করেছে— তার তীব্র নিন্দা করেছে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। বিগত নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৬০,০০০ গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ করবে। ২০১৭ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি হয় মাত্র ৬০০০ পদ পূরণের জন্য। সরকার তাও পূরণ করেনি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একসাথে তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি। এখনও ১৫০০০-র বেশি পদ খালি পড়ে আছে।

এরই প্রতিবাদে উত্তীর্ণ ওয়েটিং লিস্ট -এর প্রার্থীদের চাকরির দাবিতে অবস্থানরত প্রায় দুইশত প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যায়। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে অবিলম্বে তাঁদের মুক্তির পাশাপাশি ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন।

কিষান মার্চের প্রস্তুতিতে কোচবিহারে এআইকেকেএমএস-এর সমাবেশ

সিএএ এবং এনআরসি বাতিল ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ১-২ মার্চ কিষান মার্চ-এর ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। জয়নগর থেকে কলকাতা, মেচেদা থেকে কলকাতা, হাবড়া থেকে কলকাতা এবং জলপাইগুড়ি থেকে উত্তরকন্যা পর্যন্ত এই কর্মসূচি সফল করতে রাজ্যজুড়ে কৃষকদের সংগঠিত করছে কেকেএমএস।

১৩ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের ধাপরাহাটে এই উপলক্ষে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রুহুল আমিন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষক নেতা কমরেডস প্রফুল্ল রায়, মলিন সিংহ সরকার। কমরেড আমিন ক্ষোভের সাথে বলেন, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমান বিজেপি সরকার কৃষক সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে ফাঁকা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে চলেছে। সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনে কৃষক আত্মহত্যা, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ব্যাপক পঞ্চায়েতী দুর্নীতি ইত্যাদির উল্লেখ করে তিনি বলেন তৃণমূল শাসনেও একই জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভোট আর সরকার বদলের চক্রে এই সংকট থেকে মুক্তি নেই। চাই নিচুতলা থেকে প্রবল আন্দোলন। শাহিনবাগ আন্দোলনকে স্যালুট জানিয়ে তিনি বলেন, এই অবস্থান দেখাল গণআন্দোলনের কী অপরিসীম শক্তি। গণআন্দোলনের পথেই কৃষকদের দাবি আদায়ের জন্য তিনি কিষান মার্চ সফল করার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com